গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা | ২৯ মে - ৪ জুন ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কিউবায় আগ্রাসন চালাতে মার্কিনী ষড়যন্ত্র, বিশ্ববাসী সতর্ক ও সজাগ থাকুন

প্রভাস ঘোষ

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে গোপন সামরিক কার্যকলাপ চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে অপহরণ করার মতো অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছে। এরপর তারা নিজের দোসর জায়নবাদী ইজরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে বিনা প্ররোচনায় ইরানের ওপর বর্বর সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছে। এ বার তারা সমাজতান্ত্রিক কিউবার দিকে বন্দুক তাক করেছে। তেল ও অন্যান্য পণ্যে কঠোর অবরোধ জারি করে কিউবাকে ইতিমধ্যেই শক্তি-সংকট সহ আর্থ-সামাজিক সংকটে ঠেলে দিয়েছে আমেরিকা। বিশ্বের প্রতিটি অংশে আধিপত্য কায়েম করার কোনও সুযোগই ছাড়তে রাজি নন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিউবাকে পদানত করে গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় বাধাহীন আধিপত্য কায়েম করতে চাইছেন তিনি।

১৯৫৯-এর কিউবা বিপ্লব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট স্বৈরাচারী বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করেছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির সংগ্রামে প্রেরণার উৎস কিউবা সেই থেকে আমেরিকার সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবিপ্লবের ষড়যন্ত্র করে আমেরিকা বার বার কিউবায় সরকার উচ্ছেদ করতে চেয়েছে, কিন্তু বার বারই তারা ব্যর্থ হয়েছে।

সম্পূর্ণ আর্থিক অবরোধ জারির মাধ্যমে কিউবার মানুষের জীবনে

সাতের পাতায় দেখুন

রুটি রুজি দেওয়ার বদলে তা কেড়ে নিচ্ছে নতুন সরকার

পুনর্বাসন ছাড়াই হকার ও বস্তি উচ্ছেদের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ডাকে জয়নগরে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ নেতৃবৃন্দ। ২৪ মে ■ এআইইউটিইউসি-র ডাকে কলকাতায় লেনিন মূর্তি থেকে মিছিল। ১৯ মে

নতুন সরকার মানে কি মাথার উপরের ছাউনিটুকু, জীবিকা অর্জনের উপায়টুকুকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া, সন্তান-পরিবারকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে প্রকাশ্য রাস্তায় বসে থাকার ব্যবস্থা! অন্তত যে হাজার হাজার হকার এবং রেল সহ নানা বস্তির মানুষদের উচ্ছেদ করা শুরু করেছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার, তাদের জীবনে এর আর অন্য কোনও মানে নেই। এমন কথাই বারে বারে উঠে এসেছে শিয়ালদহ, হাওড়া, বেলঘরিয়া, সোনারপুর, পার্ক সার্কাস প্রভৃতি রেল স্টেশনের দোকানদার এবং ঝুপড়িবাসীদের বক্তব্যে।

শিয়ালদহ দক্ষিণ স্টেশনের ঘুঘনি, মুড়ি বিক্রেতা অরুণ মণ্ডল বললেন, এক সময়ে আমার বাবা বসতেন এই দোকানে। এই দোকানের উপরই নির্ভর গোটা পরিবারের। সমস্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে রেল পুলিশ। জিনিসপত্র সরানোর সময়টুকুও দেয়নি। এটাই কি আমাদের নতুন সরকারের উপহার! আমরা এখন যাব কোথায়? খাব কী? শিয়ালদহ উত্তর স্টেশনের ঝালমুড়ি বিক্রেতা অনিল নাইয়া ক্ষোভের সাথে বললেন, জানি না, ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী যে দোকান থেকে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন, সেটি বৈধ নাকি অবৈধ। কিন্তু রেল পুলিশ অন্য অনেক দোকানের মতো আমার ঝালমুড়ির দোকানটিও ভেঙে দিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা আর পড়াশোনা করতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

সোজা সীমান্তরক্ষীদের কাছে পাঠানোর ফরমান মুখ্যমন্ত্রীর

বিজেপি শাসনে কি পুলিশই আদালতের কাজ করবে

এ বার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি সবচেয়ে বেশি গলা চড়িয়েছিল অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। সিএএ-র আওতার বাইরের অনুপ্রবেশকারীদের— সোজা কথায় বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়া মুসলমানদের 'ডিটেক্ট' ও 'ডিলিট' করে তারপর তাদের 'ডিপোর্ট' করে দেওয়ার হুঙ্কার তাদের প্রায় প্রতিটি প্রচারসভাতেই শোনা গেছে। অনুপ্রবেশকারীদের ডিটেক্ট তথা চিহ্নিত করে তাঁদের ডিলিট অর্থাৎ ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য রাজ্য জুড়ে প্রবল শোরগোল তুলে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে 'এসআইআর'-এর বুলডোজার চালিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার দেওয়া কেউই সমর্থন করে না। কিন্তু এসআইআর-এর অজুহাতে উপযুক্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিককে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেগে দিয়ে 'বিচারাধীন' রেখে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে কোনও কারণ ছাড়াই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। বলা বাহুল্য, বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বলি, চরম অন্যায়ের শিকার এই মানুষগুলির বেশিরভাগই ধর্মে মুসলমান।

এই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ 'ট্রাইবুনাল' নামক প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা একটি প্রক্রিয়ার ভরসায় ঝুলিয়ে দিয়ে হয়ে গেল এ বারের বিধানসভা নির্বাচন, প্রায় নজিরবিহীন ভাবে। এত সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন ও চুরি-দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ রাজ্যের জনসাধারণ বিপুল ভোটে জিতিয়ে ক্ষমতায় এনেছে বিজেপিকে। এই ভোট যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যালঘু মানুষও আছেন। অথচ সরকারে বসেই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে আবার প্রবল উৎসাহে অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এবং দেখা যাচ্ছে, তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য যথারীতি মুসলমান ধর্মের মানুষরাই, যাঁদের সিএএ-র আওতায় রাখা হয়নি। ২১ মে হাওড়ায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বড়কর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের বলেছেন— "পুলিশ কমিশনারকে এবং আরপিএফ-কে সরাসরি বলে দেওয়া হয়েছে, হাওড়া স্টেশন থেকে সিএএ-র আওতায় পড়েন না এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে কোর্টে পাঠাবেন না। ... সোজা বনগাঁ-পেট্রাপোল সীমান্তে, নইলে বসিরহাটে বর্ডার আউটপোস্টের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন" (দ্য টেলিগ্রাফ, ২২ মে, '২৬)।

চারের পাতায় দেখুন

সরকারি কর্মচারীদের মুখ বন্ধের ফরমান জারি করল বিজেপি সরকার

প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

২০ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব কর্তৃক প্রকাশিত এবং পরদিন সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ২১ মে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন,

সমবেত প্রতিবাদে প্রথম সার্কুলারটি সংশোধন করলেও এই সার্কুলারের বলে বাস্তবে সরকারি কর্মচারী, সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, আধা-সরকারি সংস্থা, কর্পোরেশনের কর্মীদের সংবিধান প্রদত্ত মতামত প্রকাশের অধিকারকে হরণ করা হল। তাঁরা সরকারের কোনও পদক্ষেপকে সমালোচনা করতে পারবেন না, পূর্ব-অনুমতি ছাড়া পত্র-পত্রিকায় লিখতে বা সম্পাদনা করতে পারবেন না, মিডিয়া বিতর্কে অংশ নিতে পারবেন না। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কর্মরত কর্মচারীদের জন্য এটা বলবৎ থাকলেও আমাদের রাজ্যে তা কার্যকর ছিল না। নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার সেই অধিকারগুলি হরণ করতে চলেছে। এর দ্বারা সরকার বাস্তবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সরকারের তল্পিবাহকে পরিণত করতে চাইছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে এই কালা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

সাথে সাথে আমরা দলমত নির্বিশেষে সকল সরকারি কর্মচারী, শ্রমজীবী মানুষ সহ সাধারণ মানুষকে এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

কেড়ে নিচ্ছে নতুন সরকার

একের পাতার পর

পারবে না। বললেন, হকারদের কথা একটু ভাবলে সরকারের কি উচিত ছিল না বিকল্প ব্যবস্থা করা! আমরা তো এ দেশেরই নাগরিক। বললেন, আশ্চর্যের বিষয়, আমি এ বার বিজেপিকেই ভোট দিয়েছি। এখন ভাবছি, ভুলই করেছি। চিনতে পারিনি।

অন্য চিত্রও দেখা গেছে। জয়নগর সহ বহু স্টেশনে হকাররা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে আটকে দিয়েছেন উচ্ছেদ অভিযান। বলেছেন, বুলডোজার চালাতে হলে আমাদের বুকের উপর দিয়ে চালাতে হবে।

রাজ্য জুড়ে আজ হাজার হাজার রেল হকার, স্ট্রিট হকার, ভ্রাম্যমান হকার প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত এমন জীবিকা হারানো মানুষের হাহাকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাস্তবে হকারি পেশায় নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্পে নির্মিত মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সস্তায় খাবার পরিবেশন করে আর্থিক সংকটের মধ্যেও কোনওক্রমে সংসার প্রতিপালন করে থাকেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, পরিবারের চিকিৎসা সহ দৈনন্দিন বেঁচে থাকার রসদটুকু সংগ্রহ করেন এই জীবিকার মাধ্যমে। পাশাপাশি বন্ধ কারখানার শ্রমিক, গ্রামীণ ভূমিহারা মানুষ, জনসাধারণের পরিশ্রম, অর্থে গড়ে ওঠা রেল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। রেল লাইনের পাশে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া ভূমিহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস করে নগর জীবনে পরিচারিকার কাজ, সাফাই কর্মীর কাজ, অটো টোটো-রিক্সা চালক এবং লোডিং আন-লোডিংয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁদের উপরেও এই সরকারের আরপিএফ এবং রেল কর্তৃপক্ষ নামিয়ে এনেছে নজিরবিহীন আক্রমণ।

হকার আইন ২০১৪ (প্রোটেকশন অফ লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন) থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন তৃণমূল সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন করেনি এবং বর্তমান বিজেপি সরকারও ভেন্ডিং কমিটি গঠনের উদ্যোগ এখনও নেয়নি। বারবার দাবি করা সত্ত্বেও সরকারের সকল স্তরের আধিকারিকদের জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি হকার আইন ২০১৪ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বিধি (রুল) তৈরি করা হয়নি। অর্থাৎ সরকার আইনের কোনও তোয়াক্কা না করেই বুলডোজার দিয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকা ছিনিয়ে নিচ্ছে। কার স্বার্থে এই গরিব নিধন?

বাস্তবে সংকট জর্জরিত বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আজ দেশের শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত কোনও অংশের যুবকদেরই কাজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। মুনাফাভিত্তিক বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন-জীবিকা আজ মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতের মুঠোয় বন্দি। এই অবস্থায় বন্ধকলকারখানার শ্রমিক, গ্রামীণ জীবনে ভূমিহারা মানুষকে বাধ্য হয়ে হকারিকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে হয়। এই কাজ ছাড়া জীবিকা অর্জনের দ্বিতীয় রাস্তা তাঁদের নেই। পাশাপাশি রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো টাকা রোজগারের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাঁদের পথে থাকতে হয়, এই হকারদের কাছ থেকে পাওয়া সস্তা দরের খাবার-দাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাদের ভরসা। রেলস্টেশন ও রাস্তার দু'পাশে হকাররা না থাকলে শ্রমজীবী জনতার এই অংশটিও ঘোর বিপদে পড়বেন।

হকার সমস্যা পুঁজিবাদী শাসন-শোষণেরই ফল। অথচ সরকার আজ বৈধ-অবৈধ প্রশ্ন তুলে, উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে বিরাট অংশের মানুষের জীবিকার অধিকার, বাঁচার অধিকারকেই কেড়ে নিচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, যে উন্নয়ন মানুষের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয় তা তাহলে কার উন্নয়ন। যে রাষ্ট্র মানুষকে কাজ দিতে পারে না, মাথার উপর একটু ছাদ দিতে পারে না, তার কি অধিকার রয়েছে ন্যূনতম রুজির, কোনও ক্রমে বেঁচে থাকার মতো আস্তানাকেও এ ভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়ার? তা হলে সে রাষ্ট্র কাকে রক্ষা করছে?

বাস্তবে রেল কর্তৃপক্ষ রেল প্লাটফর্মে বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করবার সুযোগ করে দিচ্ছে। এমনকি গোটা রেল ব্যবস্থাকেই নানা অংশে বিভক্ত করে তা বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে ব্যবসা করে অবাধ মুনাফা লুটবার সুযোগ করে দিচ্ছে। দেশের পুঁজিপতিরা রেল, স্ট্রিট ও ভ্রাম্যমান হকারদের এই বিশাল বাজার দখল করতে চায়। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থেই সরকার আজ হকার উচ্ছেদ করছে।

হকার উচ্ছেদ পুঁজিবাদী সরকারের একটি কর্মসূচি। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় শাসক দলগুলি নানা রাজ্যে এ কাজ করে চলেছে। অতীতে সিপিএম সরকারও 'অপারেশন সানসাইন' নাম দিয়ে হকারদের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিয়েছে। একদা তৃণমূল হকার উচ্ছেদের বিরোধিতা করলেও ক্ষমতাসীন হয়ে জেলায় জেলায় হকার উচ্ছেদ করেছে। হকারদের বুঝতে হবে, এই আক্রমণ শ্রমজীবী মানুষের উপর পুঁজিপতি শ্রেণির আক্রমণ।

পাশাপাশি, সমাজের যে আপাত সচ্ছল অংশ, যাঁরা কোনও রকম বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই এই উচ্ছেদকে সমর্থন করছেন, সরকারকে বাহবা দিচ্ছেন, তাঁদের একটা বিষয় ভেবে দেখতে হবে। আপাত সুরক্ষিত অবস্থান থেকে সহনাগরিকদের সম্পর্কে তাঁদের এই আচরণ কি আসলে তাঁদের বিবেক এবং মনুষ্যত্বের উপরই এক অদৃশ্য বুলডোজার চালানোর অনুমতি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া নয়? এক অংশের মানুষের উপর সরকারের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণ যদি সামাজিক সমর্থন পেয়ে যায় তবে আগামী দিনে অন্য এক অজানা দিক থেকে তাদের উপর হঠাৎ এসে পড়া কোনও আক্রমণের সময় পাশে দাঁড়ানোর মতো মানুষ তাঁরা সমাজে খুঁজে পাবেন তো!

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি মধুসূদন বেরা এবং সম্পাদক শান্তি ঘোষ সরকারের এই দানবীয় আচরণের তীব্র বিরোধিতা করে হকার, বস্তিবাসী সহ সমস্ত আক্রান্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই আক্রমণকে প্রতিহত করার ডাক দিয়েছেন। অবিলম্বে এই উচ্ছেদ বন্ধ করে মানবিক দৃষ্টিতে বিষয়টিকে দেখার জন্য তাঁরা রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন।

হকারদের লড়াই চলছে

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে ও অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সহযোগে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। ১৯ মে কলকাতার ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, সহসভাপতি শান্তি ঘোষ প্রমুখ। উচ্ছেদ হওয়া হকাররা মিছিলে অংশ নেন। বর্ধমান শহর জনপ্রিয় হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগ ও অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সহায়তায় হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। বাঁকুড়ার মাচানতলায় অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং, বারুইপুর জয়নগর, দক্ষিণ বারাসাত ও মালদায় অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে। অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরে উচ্ছেদ হওয়া হকাররা পুনর্বাসন পেয়েছেন। শিয়ালদা ও খড়্গপুরের ডিআরএম এবং হাওড়া রেলওয়ে ম্যানেজারের কাছে হকারদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে রেল হকারদের হকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। বারুইপুর, ক্যানিং ও সোনারপুরে হকারদের দাবি নিয়ে রেল অবরোধ হয়েছে। ডায়মন্ডহারবারেও দীর্ঘদিন ধরে হকারদের সংগঠিত করে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। কলকাতা ভ্রাম্যমান হকার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে জাতীয় সড়কের উপরে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলছে। আন্দোলন করেই হকাররা তাঁদের পেশাকে আজও রক্ষা করে রাখতে পেরেছেন। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে রুখতে হকারদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

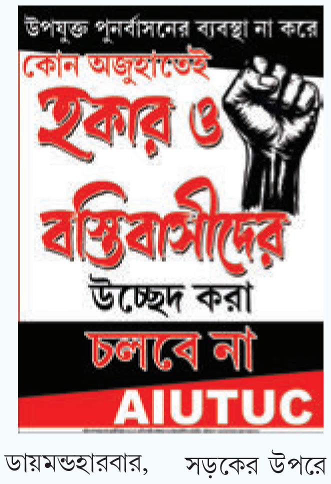

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়াঘাট স্টেশন সংলগ্ন রানিনগর গ্রামের বাসিন্দা, দলের আবেদনকারী সদস্য কমরেড জাহাঙ্গির হোসেন ২৪ এপ্রিল প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে হঠাৎই দ্রুতগামী ট্রেনের সামনে পড়েন। এই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

কমরেড জাহাঙ্গির হোসেন একসময় সিপিএম দলের কর্মী ছিলেন। সিপিএম সরকারের নানা জনবিরোধী কাজ লক্ষ করে তিনি এই দল থেকে সরে আসেন। নব্বই-এর দশকে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে এসইউসিআই(সি)-র কাজ শুরু করেন। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক জাহাঙ্গির হোসেন এলাকায় প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পরিবারের মধ্যেও দলের চিন্তা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। এমন একজন মানুষের অকালমৃত্যুতে দল ও সমাজের ক্ষতি হল।

কমরেড জাহাঙ্গির হোসেন লাল সেলাম

পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড শক্তিপদ মাজি ২৩ এপ্রিল কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪২ বছর।

কমরেড শক্তিপদ মাজি ২০০৪ সাল নাগাদ যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে বেকারি বিরোধী-অপসংস্কৃতি বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে এস ইউ সি আই (সি) দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং আবেদনকারী সদস্য নির্বাচিত হন।

তাঁর সদা হাস্যময় চারিত্রিক মাধুর্য এমনই ছিল যে, সকলকে খুব সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। এলাকার মানুষের বিপদে আপদে যে কোনও সমস্যায় সাথে থাকতেন। শিক্ষা সংকট, জমি রক্ষা, বেকার যুবকদের কাজ ও এলাকার মদবিরোধী আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক মাস সে ভাবে কাজ করতে না পারলেও দলের সমস্ত খোঁজখবর রাখতেন। বাড়ি থেকেই তাদের সমস্যায় বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করতেন।

তাঁর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের অত্যন্ত আপনজনকে, পরিবার হারাল তাদের একমাত্র অবলম্বনকে এবং দল হারাল এক সম্ভাবনাময় যুব কর্মীকে।

১৬ মে তাঁর স্মরণে দুরমুট গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকবার্তা পাঠ করেন লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তিনকড়ি মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ মাজি।

বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কমরেড শক্তিপদ মাজি লাল সেলাম

আপনাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে

শিবদাস ঘোষ

আপনাদের তিনটি জিনিস একসঙ্গে চর্চা করতে হবে। প্রথমত, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আপনাদের গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং সেটা সাধারণ ভাবে নয়। আপনাদের মনে রাখতে হবে, শুধু মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিনের কতকগুলো 'ইউনির্ভাসাল' (সাধারণ সর্বজনীন) ভাষ্য আয়ত্ত করার নাম মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করা নয়। ভারতবর্ষের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিশেষীকৃত প্রয়োগ পদ্ধতি কী হবে এবং তাকে বিশেষ ভাবে কোথায় কতটুকু 'এনরিচ' (উন্নত করা), 'ইলাবরেট' (সম্প্রসারিত করা) বা 'কংক্রিটাইজ' (বিশেষীকৃত) করার দরকার আছে, তা আপনাদের বুঝতে হবে। আর 'সিউডো মার্ক্সইজম' (মেকি মার্ক্সবাদ), 'স্যাম মার্ক্সইজম' (ভুয়া মার্ক্সবাদ) বা সংশোধনবাদ থেকে যথার্থ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পার্থক্য কী ও কোথায় এবং এক একটা বিশেষ আন্দোলনের মধ্যে, সংযুক্ত আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলনের স্লোগান বা কর্মসূচি আপাতদৃষ্টিতে এক হলেও সত্যিকারের বিপ্লবীদের সঙ্গে মেকি মার্ক্সবাদীদের আন্দোলন সংক্রান্ত 'অ্যাঙ্গুলারিটি' (দৃষ্টিভঙ্গি), 'অ্যাপ্রোচ' (কায়দাকানুন) ও কলাকৌশলগত পার্থক্য কী— তা আপনাদের আলাদা করে বুঝতে হবে, শিখতে হবে। এই হচ্ছে প্রথম জিনিস যেটা আপনাদের করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আন্দোলনের আদর্শ এবং মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ঠিক রাখার বিষয়টিও এই একই 'ক্যাটিগরি'র মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত, আপনাদের সাহসী হতে হবে, 'ডিটারমাইন্ড' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) হতে হবে এবং চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তৃতীয়ত, আপনাদের রাজনৈতিক উদ্যোগ নিতে হবে এবং সকলের আগে নিতে হবে ও নিজেদের এই উদ্যোগকে সবসময় জীবন্ত রাখতে হবে। এর মানে হচ্ছে, আপনারা উদ্যোগ নিতে কোনও সময়ই পিছিয়ে পড়েননি। যেমন ধরুন, আন্দোলনের একটা 'ইস্যু' এসেছে, অথবা দেখা যাচ্ছে, একটা ইস্যু তুললে জনসাধারণ সেটা নেবে— এ রকম অবস্থায় অন্য কেউ সেই ইস্যুটা তোলবার আগেই যাতে আপনারা জনসাধারণের মধ্যে ইস্যুটা তুলে জনসাধারণকে সংগঠিত করে সামনে এগিয়ে যেতে পারেন— আপনাদের উদ্যোগ সে রকম হওয়া চাই। কেউ ডাকার অপেক্ষায়, জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষায় বা আপনাদের পাঠাবার অপেক্ষায়, 'কনট্যাক্ট' (যোগাযোগ) দেওয়ার অপেক্ষায় জবুথবু হয়ে আপনাদের বসে থাকতে হয় না। তা ছাড়া আপনাদের যোগাযোগ পাওয়ার কী দরকার আছে? আপনারা তো আর একা একা একটা জায়গায় থাকেন না— আপনাদের চারপাশে কোটি কোটি লোক রয়েছে। কাজেই যোগাযোগের কী দরকার আছে? যোগাযোগ পেলে কাজের সুবিধা হয় ঠিকই। কিন্তু যোগাযোগ না পেলে আপনাদের 'আইসোলেটেড' (বিচ্ছিন্ন) হয়ে বসে থাকতে হয় এবং যোগাযোগ নেই বলে আপনারা কাজ করতে পারেন না— এ রকম হবে কেন?

আপনাদের যোগাযোগ পাওয়ার কী দরকার আছে? আপনাদের চারপাশে কোটি কোটি লোক রয়েছে। যোগাযোগ পেলে কাজের সুবিধা হয় ঠিকই। কিন্তু যোগাযোগ না পেলে আপনারা কাজ করতে পারেন না— এ রকম হবে কেন?

তা হলে, তিনটি জিনিস আপনাদের হাতিয়ার করে চলা দরকার। একটা হচ্ছে, 'ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন অ্যান্ড রি-লার্ন, এডুকেট অ্যান্ড রি-এডুকেট ইয়োরসেলফ'। অর্থাৎ, আপনাদের পড়তে হবে এবং বারবার করে পড়তে হবে, বারবার করে শিখতে হবে এবং জানতে হবে একই কথা। কারণ, যতবার পড়বেন, তত উন্নতরূপে, তত ভাল ভাবে, তত গভীরে তার উপলব্ধি আপনাদের মধ্যে ঘটতে থাকবে। অনেকের এ রকম একটা ধারণা আছে যে, একবার একটা জিনিস পড়া হয়ে গেলেই তো সেটা বোঝা হয়ে গেল, আবার দ্বিতীয়বার সেই জিনিসটা পড়ার দরকার নেই। অর্থাৎ তাঁরা ধরে নেন, তাঁরা যখন বিষয়টা একবার পড়েছেন, তখন আর পড়বার দরকার কী? এটা ভুল ধারণা। আমার নিজের অভিজ্ঞতাই আমি বলি। একই সাহিত্য, একই লেনিনের বই, একই মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-এর বই নানা সময়ে পড়তে গিয়ে প্রথমে যা বুঝেছি, কয়েক বার পড়ার পর পড়তে গিয়ে তার অর্থ নতুন ভাবে আমার কাছে ধরা পড়েছে। প্রথমের বোঝাটা ভুল হয়েছে, এ কথা বলছি না। কিন্তু কয়েক বার পড়ার পর যে জিনিসটা ধরা পড়েছে, সেটা নিশ্চিতরূপে আগের চাইতে উন্নত উপলব্ধি। ফলে, যত বারবার করে পড়বেন, তত আপনাদের উপলব্ধি ভাল হবে। সাথে সাথে দলের আদর্শ ... এবং সাধারণ ভাবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বললেও ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে তার বিশেষীকৃত রূপ কী এবং বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লাইন কী, তা আপনাদের বুঝতে হবে। ... আর একটা কথাও মনে রাখবেন, তা হচ্ছে নিজের রাজনীতি মানুষ তখনই ভাল বোঝে, যখন অপরের রাজনীতিটাও সে ভাল বোঝে। এ দুটো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ কথাটা একই— নিজের রাজনীতি খুব ভাল বোঝার মানে অপরের রাজনীতি খুব ভাল বোঝা। আবার, অপরের রাজনীতি তখনই একজন খুব ভাল বোঝেন, যখন নিজের রাজনীতি ভাল বোঝেন। অপরের রাজনীতি ভাল না বুঝলে প্রমাণ হয় যে, নিজের রাজনীতি বোঝার মধ্যেও ফাঁকি আছে। যে যত নিজের রাজনীতি ভাল বোঝে, সে অপরের রাজনীতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পায় এবং ভাল বোঝে। অপরের রাজনীতি ভাল না বুঝলে নিজের রাজনীতিও গোলমাল করে বোঝা হয়, ভুল বোঝা হয়। তা হলে, লড়াইয়ের মূল আদর্শ ও রাজনৈতিক লাইন এবং তারই সাথে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে কোথায় পার্থক্য, তা ঠিক করা হচ্ছে আপনাদের প্রথম কর্তব্য।

দ্বিতীয় কর্তব্য আপনাদের হচ্ছে, এই মূল আদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ঠিক করার সাথে সাথে তার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করবার জন্য তার পরিপূরক নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির সুরটি গড়ে তোলা। এটা গড়ে তোলবার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে আপনাদের দরকার, সমস্ত 'অডস'-এর (প্রতিকূলতার) বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সব কিছু দেওয়ার মানসিকতা, এমনকি দরকার হলে প্রাণ দেওয়ারও মানসিক প্রস্তুতি। ...

তৃতীয়ত, এর সাথে চাই আপনাদের রাজনৈতিক উদ্যোগ। এই রাজনৈতিক উদ্যোগ এমন হওয়া চাই যে, প্রত্যেকেই আপনারা নিজের পরিকল্পনায় কিছু না কিছু কাজ করছেন, আপন নিয়মে জনসংযোগ করছেন, ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছেন, অন্তত আর কিছু না পারেন ... যেখানে আপনাদের প্রচুর বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা আপনাদের সততা ও চরিত্রের মাধুর্যে আপনাদের ভালবাসেন, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। এইটুকুও যদি আপনারা করে রাখেন, মনে রাখবেন, আন্দোলন গড়ার পক্ষে সেটাও অনেক কার্যকরী। আবার, এরই সঙ্গে আর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাও আপনাদের মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে, কাজ হয়তো আপনারা করলেন, কিন্তু সেটা করলেন আপন নিয়মে— কাজের ধারা কখনওই আপনাদের এ রকম হওয়া উচিত নয়। 'প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগ চাই'— এ কথার মানে এ নয় যে, প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ভাবে যার যার মতো ক্রিয়া করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অর্থাৎ এই ব্যক্তিগুলোর ক্রিয়ার মধ্যে কোনও সংযোগ নেই বা 'সেন্ট্রালিজম' নেই। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে আগে বাড়ানো, কাজকর্মের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করা— এ কথার যথার্থ অর্থ হচ্ছে, একই সঙ্গে 'সেন্ট্রালিজম'-কে (একেন্দ্রিকতাকে) শক্তিশালী করা। এগুলো সেন্ট্রালিজম-কে 'কাউন্টারপোজ' (বিরোধিতা) করার জন্য বা তাকে দুর্বল করার জন্য নয়। বরং সেন্ট্রালিজম-কে 'মেকানাইজেশন' (যান্ত্রিকতা) থেকে মুক্ত করার জন্য 'বুরোক্রেটিক টেনডেন্সি' (ঝোঁক) থেকে মুক্ত করার জন্য, দলের সমস্ত কর্মীদের কর্মক্ষমতা বাড়াবার জন্য, সমস্ত 'রিসোর্স' (শক্তি) যা হাতের মধ্যে রয়েছে তার 'প্রপার ইউটিলাইজেশন'-এর (যথাযথ ব্যবহারের) জন্যই এটা অত্যন্ত দরকার। এর 'আলটিমেট' (আসল) লক্ষ্য হচ্ছে, একদিকে প্রতিটি কর্মীর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে সামগ্রিক ভাবে দলীয় ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানো, অপর দিকে বুরোক্রেটিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করে সেন্ট্রালিজম-কে শক্তিশালী করতে থাকা। মনে রাখবেন, বিপ্লব সফল করার ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। সেই জন্য আপনাদের স্লোগান হবে, 'স্টাইল অব ওয়ার্ক' (কাজের পদ্ধতি) উন্নত করতে হবে, 'স্টিরিওটাইপ ওয়ার্ক' (গতানুগতিক কাজের পদ্ধতি) পাল্টাতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, অবস্থা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ কাজের পদ্ধতি 'রিমোল্ড' করতে (পাল্টাতে) পারেন, এমন 'ফ্লেক্সিবিলিটি' (পরিবর্তনশীলতা) আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং কাজকর্মের 'ডেমোক্রেটিক ফাংশনিং' (গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার) উপর আপনাদের জোর দিতে হবে। আর, সংগঠিত ভাবে সকলে মিলে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে পারার ক্ষমতা আপনাদের আয়ত্ত করা চাই। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় যে তিনটি কথা বললাম, তার মধ্যেই এটা নিহিত রয়েছে। ...

আপনারা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের এই একটি মাত্র দল এসইউসিআই এবং তার গণসংগঠনের উপর মানুষ যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করে রেখেছে। আপনারা কী করেন, গভীর আগ্রহের সাথে মানুষ সেটা লক্ষ করছে। তাদের মনের মধ্যে সংশয় রয়েছে যে, আপনারা ছোট, আপনারা পারবেন কি না। আপনাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু আমাদের যতটুকু শক্তি আছে, ভারতবর্ষের তুলনায় তা আজকে আর তত ক্ষুদ্র নয়, একটা কাজ শুরু করবার পক্ষে তো নয়ই। ফলে, আপনাদের এই চ্যালেঞ্জ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

'ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলন ও ছাত্রদের কর্তব্য'

বেতন কমিশন প্রসঙ্গে সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েও বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার বিষয়ে দ্বিতীয় ক্যাবিনেট মিটিং-এ আলোচনা না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কর্মচারী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন (পিএসকেইউ)। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস ১৮ মে এক বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানান। তিনি বলেন, এই ঘটনা কয়েক লক্ষ কর্মচারী ও পেনশন প্রাপকদের বিস্মিত ও আশাহত করেছে।

নবগঠিত রাজ্য সরকারের কাছে সংগঠনের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মান্যতা দিয়ে রোপা-২০০৯ অনুযায়ী সমস্ত বকেয়া, বিগত সরকারের বাজেট অধিবেশনে ঘোষিত ৪ শতাংশ সহ এআইসিপিআই-এর সাপেক্ষে পিছিয়ে থাকা ৪২ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে ও মহার্ঘ্য ভাতার স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ করারও দাবি জানান তিনি।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

বিধাননগর

হাওড়া সদর

দশ দিনের মধ্যে চারবার পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে বিজেপি সরকার। ফলে পেট্রলের দাম লিটার পিছু ৮ টাকা ও ডিজেলের দাম ৭ টাকার বেশি বেড়েছে। এর ফলে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। চাষিরা বাড়তি দামে ডিজেল কিনে সেচের পাম্প চালাতে গিয়ে বিপুল ক্ষতির সামনে পড়ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আদানি-আম্বানির মতো ধনকুবেরদের মালিকানাধীন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলির লাভ অটুট রাখার জন্য জনগণের ঘাড়ে বিপুল বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে সারা দেশেই এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) আন্দোলনে নেমেছে। দেশের সমস্ত রাজ্যের রাজধানী এবং দিল্লিতে দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ হয়। পশ্চিমবঙ্গেও কলকাতা সহ প্রতিটি জেলায় বিক্ষোভ মিছিল হয়। একই সাথে রাজস্থানে দুই বোনের ওপর গণধর্ষণের পরিণতিতে তাঁদের আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনার প্রতি তীব্র ধিক্কার ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। কলকাতায় ১৯ মে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী সহ নেতৃবৃন্দ।

১৪ জন শ্রমিক ছাঁটাই পুরুলিয়ার কারখানায়
ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হলেন শ্রমিকরা

ন্যূনতম মজুরি, শ্রমিকদের আইনসিদ্ধ অধিকার, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচা এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর কারখানার শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবিতে মুখ খুলেছিলেন শ্রমিকরা। সেই অপরাধে পুরুলিয়ার আনাড়ায় অবস্থিত রেডিকেম পিগমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃপক্ষ এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ৯০ শতাংশ শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী কারখানার একমাত্র রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের সম্পাদক মহেশ্বর দাস সহ ১৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেয়।

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি শোনার পরিবর্তে মালিকপক্ষ যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও প্রতিহিংসামূলক পথ বেছে নিয়েছে, তা শুধু শ্রম আইন বিরোধী নয়, মানবিকতার বিরুদ্ধেও এক জঘন্য আঘাত। যে শ্রমিকদের ঘাম ও পরিশ্রমে কারখানার উৎপাদন চলে, মুনাফার পাহাড় গড়ে ওঠে, সেই শ্রমিকদেরই আজ প্রতিবাদ করার শাস্তি হিসেবে ছাঁটাই করা হচ্ছে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী শোষণ যত বেড়েছে, প্রতিবাদও তত শক্তিশালী হয়েছে। এই অন্যায় ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত রেডিকেম পিগমেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নেমেছেন। ভয়, হুমকি, চাপ কিংবা দমননীতি কোনও কিছুই তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম থেকে সরাতে পারেনি।

প্রচলিত আইন অনুযায়ী আসানসোলে শ্রম কমিশনার আলোচনার জন্য সভা ডাকেন। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি নিয়ে আলোচনায় বসার ন্যূনতম সদিচ্ছাও মালিকপক্ষ দেখায়নি। শ্রম কমিশনারের ডাকা সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মালিকপক্ষ অনুপস্থিত থেকে কার্যত আইন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকেই অবমাননা করেছে এবং অচলাবস্থা তৈরি করেছে।

শ্রমিকরা পাড়া থানায় অভিযোগ জানালে থানা কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষকে আলোচনার জন্য থানায় ডেকে পাঠায়। সেখানে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি এবং ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক পক্ষ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাদের ন্যায্য দাবিগুলি সেখানে তুলে ধরে। মালিকপক্ষও তাদের বক্তব্য জানায়। সব কিছু শোনার পর থানা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে এই শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা করার যথাযথ কর্তৃপক্ষ হলেন শ্রম কমিশনার। অতএব আইনি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

তবুও মালিকপক্ষ নিজেদের অনড় ও শ্রমিকবিরোধী মনোভাব থেকে সরে আসেনি। ফলে বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা তাঁদের আন্দোলন জারি রেখেছেন।

এই আন্দোলন কেবল ১৪ জন ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের রুটি-রুজির প্রশ্ন নয়। এটি সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির অধিকার, মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের লড়াই।

ইউনিয়নের সভাপতি এবং পুরুলিয়া জেলার এ আই ইউ টি ইউ সি-র সম্পাদক কমরেড প্রবীর মাহাতো জানিয়েছেন, দাবিগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কোনও রকম চাপের কাছে আত্মসমর্পণ না করে শ্রমিকরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবে।

পুলিশই কি আদালতের কাজ করবে

একের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর এই ফরমানে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অফিসাররাও স্তম্ভিত। সন্দেহভাজন একজন মানুষ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তিনি ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ কি না— তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব আদালতের, পুলিশের নয়। আইন অন্তত তাই বলে। কিন্তু সেই চিরাচরিত নিয়মের তোয়াক্কা না করে, সন্দেহ হলেই কাউকে, কোর্টে গিয়ে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের সুযোগটুকুও না দিয়ে, সরাসরি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশের অর্থ— মুখ্যমন্ত্রী আইনের ধার ধারেন না। আইনের একটি বুনিয়াদি কথা হল, অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। সেই সুযোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। একজন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান— তাঁর মুখ থেকে এমন বেআইনি নির্দেশ রাজ্যের জনগণের পক্ষে অত্যন্ত হতাশাজনক।

গত বছর কয়েক ধরেই বিজেপি দেশ জুড়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে ব্যাপক শোরগোল তুলে চলেছে। তারা দেখাতে চায়, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা-চিকিৎসার অভাবের মতো জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, দেশের মূল সমস্যা আসলে অনুপ্রবেশ। বিশেষ করে নিজেদের শাসনাধীন রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী হলেই তাকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে নিজেদের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারকে সত্য বলে দেখাতে চেয়েছে বিজেপি। রাজ্যে রাজ্যে স্রেফ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে দুষ্কৃতীদের হামলায় প্রাণ গেছে বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের। গত বছর জুন মাসে বীরভূম থেকে দিল্লিতে কাজ করতে যাওয়া সুনালী খাতুন, তাঁর স্বামী, নাবালক পুত্র, প্রতিবেশী সুইটি বিবি ও তাঁর দুই পুত্র সহ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে স্রেফ সন্দেহের বশে অনুপ্রবেশকারী বলে দেগে দিয়ে, নথিপত্র কোর্টে যাচাই করার সুযোগ না দিয়েই সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। অপরাধ— তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। শেষে দেশজোড়া প্রতিবাদের চাপে ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ডিসেম্বরে বীরভূমের চার পুরুষের বাসিন্দা বৈধ ভারতীয় নাগরিক আট মাসের গর্ভবতী সুনালী খাতুন ও তাঁর নাবালক পুত্রকে দেশে ফেরাতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সমস্ত বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও সেই সময় বাংলাদেশে থেকে যেতে বাধ্য হন সুনালীর স্বামী দানিশ শেখ, সুইটি বিবি ও তাঁর ছেলেরা। শেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ২২ মে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এঁদেরও আগামী ১০ দিনের মধ্যে দেশে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

সুনালী খাতুন, সুইটি বিবিদের দেশে ফিরিয়ে আনার সুপ্রিম কোর্টের আদেশে প্রমাণ হল, অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির প্রচারের পিছনে অন্য ধর্ম, বিশেষ করে মুসলমান ধর্মের মানুষের প্রতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক বিদ্বেষ যতটা রয়েছে, বাস্তব সত্য ততটা নেই। ফলে এই ঘটনায় গোটা দেশের সামনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মাথা নিঃসন্দেহে নিচু হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর পরেও পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী সেই একই বেআইনি ফরমান জারি করছেন কোন বিবেচনায়? তাঁর ভোলা উচিত নয়, রাজ্যের মানুষ— হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিপুল ভোটে তাঁদের জয়ী করেছে। মানুষ চায় শিল্প স্থাপন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো যে সব প্রতিশ্রুতি বিজেপি ভোটের আগে দিয়েছিল, নতুন সরকার এ বার একে একে সে সব পূরণ করার ব্যবস্থা করুক। তার বদলে অনুপ্রবেশ নিয়ে অকারণ হইচই বাধিয়ে, বেআইনি নির্দেশ জারি করে মুখ্যমন্ত্রী যদি জনজীবনের মূল সমস্যাগুলিকে আড়াল করার চেষ্টা করেন, রাজ্যের মানুষ তা ভাল ভাবে নেবে না।

মগরাহাট স্টেশনে হকার উচ্ছেদবিরোধী বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় ২৩ মে হকার উচ্ছেদ করা হবে বলে রেল দপ্তর নোটিস দেয়। যদিও সেই নোটিসে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ছিল না। প্রতিবাদে ওই দিন 'সারা বাংলা হকার্স, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বসতি উচ্ছেদ বিরোধী কমিটি'র আহ্বানে সহস্রাধিক হকার ও সাধারণ মানুষ মগরাহাট স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন। কমিটির সভাপতি মুন্সি আব্দুল হাই বলেন, এই লড়াইয়ে কোনও দল মত রঙ না দেখে হকারদের রুটি-রুজি রক্ষার প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালাতে হবে। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সদস্য বিশ্বনাথ সরদার বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করে গরিব মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নিয়ে রেলওয়ে হকারদের উচ্ছেদ করতে শুরু করেছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তীব্রতর করতে হবে।

পেট্রল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস, দুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে বিক্ষোভ চলছে দেশ জুড়ে।
দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ। ১৮ মে

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে প্রতিবাদ সভা। ১৮ মে

ত্রিভাষা নয়, শিক্ষায় দ্বিভাষা নীতি দাবি সেভ এডুকেশন কমিটির

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর ২১ মে এক বিবৃতিতে বলেছেন,

গত ১৫ মে-র সার্কুলারে কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিএসই-র মাধ্যমে তিন-ভাষা সূত্র কার্যকর করার নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাষা শিখতে হবে। তার মধ্যে অন্তত দুটি অবশ্যই ভারতীয় ভাষা হবে। শিক্ষার্থীরা বিদেশি ভাষা শুধুমাত্র তৃতীয় ভাষা হিসেবে নিতে পারবে যদি প্রথম দুটি ভাষা ভারতীয় হয় অথবা ঐচ্ছিক চতুর্থ ভাষা হিসেবে নিতে পারবে।

প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে ইংরেজি কোনও বিদেশি ভাষা নয় বরং এটি এ দেশের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা।

২০১৪-১৫ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত ১০ বছরের মোট ব্যয়ের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট কিছু তফসিলভুক্ত ও ধ্রুপদী ভাষার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে, অথচ অন্য ভাষাগুলিকে উপেক্ষা করেছে। ভাষাভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ হল— সংস্কৃতের জন্য ২,৫৩২.৫৯ কোটি, উর্দুর জন্য ৮৩৭.৯৪ কোটি, হিন্দির জন্য ৪২৬.৯৯ কোটি, তামিলের জন্য ১১৩.৪৮ কোটি এবং কন্নড়, তেলুগু, মালয়ালম ও ওড়িয়া— এই চার ভাষার সম্মিলিত বরাদ্দ মাত্র ৩৪.০৮ কোটি।

দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে সংস্কৃত ভাষাকে, তা দেশের কোনও অংশের সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা নয়। এরপর রয়েছে উর্দু ও হিন্দি। সুতরাং, তিন-ভাষা নীতি চাপিয়ে দেওয়া আসলে অ-হিন্দিভাষী জনগণের উপর সংস্কৃত অথবা হিন্দি, কিংবা উভয় ভাষাই চাপিয়ে দেওয়ার একটা কৌশল। একই ভাবে, হিন্দিভাষী জনগণের উপর সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়াও সমানভাবে নিন্দনীয়।

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সুচিন্তিত মত হল, অন্তত স্কুল স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা। এই সার্কুলার ইংরেজি শিক্ষার বিষয়ে নীরব, যদিও ইংরেজি ঐতিহাসিকভাবে উচ্চশিক্ষার একটি অপরিহার্য সেতু এবং বিশ্বজ্ঞান অর্জনের একটি জানালা হিসেবে গড়ে উঠেছে। সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রেও ইংরেজি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইংরেজির সঙ্গে দেশীয় ভাষাগুলির এই পারস্পরিক সম্পর্ক ভাষাগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। তাই রাষ্ট্রের উচিত মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাকেও মৌলিক অগ্রাধিকার দেওয়া। একই সঙ্গে, সমস্ত তফসিলভুক্ত ভাষার বিকাশে সরকারের সবরকম সাহায্য করা উচিত।

শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা এবং ইংরেজি এই দুই ভাষাই শেখা উচিত। যে সব মানুষের পরিবার অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে, তাঁদের সন্তানরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষা এবং ইংরেজি শিখতে পারে। আমরা এই দুই-ভাষা কাঠামোকেই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত, বৈজ্ঞানিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি বলে মনে করি। শিক্ষার্থীদের তৃতীয় ভাষা শেখার সুযোগ অবশ্যই থাকা উচিত, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক হতে হবে, কখনওই বাধ্যতামূলক নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে উপরোক্ত সিবিএসই সার্কুলার প্রত্যাহার করে তিন-ভাষা সূত্র চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করুক।

উত্তরপ্রদেশের কানপুর দেহাতে ২৪ মে অনুষ্ঠিত হয় কিসান মহাপঞ্চায়েত। কয়েকশো কৃষকের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন এআইকেকেএমএস-এর সভাপতি কমরেড সত্যবান

এ কী কথা শুনি আজ রাজনাথজির মুখে!

সন্ত্রাসবাদীদের কোনও দেশ হয় না এবং তাদের কোনও ধর্ম নেই। অত্যন্ত সহজ এক সত্য কথা। চিন্তাশীল যে কোনও মানুষ বলবেন, এ আর নতুন কথা কী? নতুন না হলেও বিস্মিত হতে হয়, যদি তা বিজেপির কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতার মুখনিঃসৃত হয়।

গত ২৮ এপ্রিল কিরঘিজস্তানের রাজধানী বিশকেক-এ সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) ভুক্ত দেশগুলির প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে কথাগুলি বলেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। অত্যন্ত সঠিক কথাই বলেছেন তিনি। কিন্তু এই সঠিক কথাগুলিই নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন বলতে পারেন না তিনি বা তাঁর দলের নেতারা? সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা বলতে গেলেই কেন সন্ত্রাসবাদী হিসাবে কোনও বিশেষ দেশকে এবং কোনও বিশেষ ধর্মের মানুষকে দেগে দেন তাঁরা? কেন এই দ্বিচারিতা? তবে কি তাঁদের কাছে ঘরের রাজনীতি আর বাইরের রাজনীতি আলাদা?

কেন্দ্রে টানা তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতাসীন বিজেপি এই মুহূর্তে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণির সবচেয়ে বিশ্বস্ত স্বার্থরক্ষাকারী দল। অপর বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস স্বাধীনতার পর থেকে টানা প্রায় ৩০ বছর দেশ শাসন করেছে। কংগ্রেস শাসনে পুঁজিপতি শ্রেণির নির্বিচার শোষণ-লুণ্ঠনে মানুষ যখন দেশের সর্বত্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছে তখন পুঁজিপতি শ্রেণি দেদার অর্থ জুগিয়ে এবং প্রচার দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই পুঁজিপতি শ্রেণিরই বিশ্বস্ত দল হিসাবে তাদের শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে বিজেপির বলার কিছু নেই। বরং পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের চরিত্রকে আড়াল করা, তাদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের ক্ষোভ যাতে বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়তে না পারে, তাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, তার প্রধানতম দায়িত্ব। তাই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কোনও রকম চেষ্টা বিজেপির রাজনীতি নয়। বাকি থাকে একমাত্র মানুষকে প্রতারণা এবং বিভ্রান্ত করার রাজনীতি। ধর্মকে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ এবং বিভাজনের রাজনীতি সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। তাই বিদেশের মাটিতে যে সত্য উচ্চারণ করেছেন বিজেপি নেতা তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, দেশের মাটিতে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সে সত্য উচ্চারণ তাঁর বা তাঁর দলের নেতাদের করা চলে না।

পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল যুগে সন্ত্রাসবাদ দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণিরই মদতপুষ্ট। সন্ত্রাসবাদের শীর্ষ মদতদাতা হিসাবে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আল কায়দা, আইসিস সহ শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির পিছনে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থ এবং পরিকল্পনাই কাজ করছে তা আজ প্রায় কারও অজানা নয়।

সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনও দেশ বা কোনও ধর্মকে যুক্ত করে প্রচার চালানোর পিছনে শাসক শ্রেণির বিশেষ উদ্দেশ্যই কাজ করে। সে উদ্দেশ্য হল, জনগণের সমস্ত দুর্দশার কারণ যে পুঁজিপতি শ্রেণি, একচেটিয়া ধনকুবের গোষ্ঠীর অবাধ লুণ্ঠন— এই সত্যটিকে আড়াল করে সন্ত্রাসবাদকে মূল শত্রু হিসাবে তুলে ধরা। অথচ কোনও একটি দেশের বা ধর্মের অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার নিন্দা এবং বিরোধিতাই করে। এসসিও গোষ্ঠীর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের এ সত্য অজানা নয়। সেই জন্যই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিরঘিজস্তানের আন্তর্জাতিক মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে অন্য রকম কিছু বলতে পারেননি।

উল্লেখ্য, পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পক্ষে অনেক চেষ্টা করেও, দু-একটি দেশের নিছক সন্ত্রাসবাদের নিন্দা ছাড়া, বেশির ভাগ দেশের সমর্থন পাওয়া যায়নি। রাজনাথ জানতেন, বিজেপির ঘরোয়া সংকীর্ণ রাজনীতির কায়দায় কথা বললে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার সমর্থন তো পাওয়াই যাবে না, উপরন্তু নিন্দা জুটবে। সম্ভবত এই কাণ্ডজ্ঞানই রাজনাথকে মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে সত্য উচ্চারণে বাধ্য করেছে। উল্লেখ্য, এই বক্তৃতার পরে ভারতে পৌঁছেই রাজনাথ তাঁর সংকীর্ণ রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন।

গণদাবী
পড়ুন ও গ্রাহক হোন
বার্ষিক মূল্য - ১৫০ টাকা, সডাক ১৬৫ টাকা

পাঠকের মতামত

নতুন রঙে কবি-মাসের আকাশে কি দুর্যোগের বার্তা?

কবি-মাসে বাংলার আকাশ বাতাসে নতুন রঙ। এই রঙে কবির নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সেই উচ্চারণে কবির হৃদয়ের বেদনা উচ্চারিত হয়নি। কবির বিশ্বমায়ের আঁচলপাতা নেই সেই উচ্চারণে। তাই এমন উচ্চারণে বাংলার আকাশ-বাতাসে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল কি না, তা সময় বলবে। তবে ঠিক এই মুহূর্তে কবিগুরুর জন্মমাসে কালবৈশাখী মেঘের নতুন রূপ দেখা দিচ্ছে। যদিও পূর্বাভাস ছিল, কিন্তু আগে থেকে সতর্ক হয়নি কেউই। তাৎক্ষণিক চাকচিক্যের মোহে মানুষ আচ্ছন্ন হয়েছে। বাহ্যিক চাকচিক্য কখনওই মনন গড়ে উঠতে সাহায্য করে না। মনন গড়ে তোলার প্রয়াসে কেউই আগ্রহ দেখায়নি। সমাজ ও রাজনীতির আকাশের মেঘের রঙ তার পরিচয় দিচ্ছে। রঙের উন্মাদনায় আজ রঙের মাহাত্ম্য হারিয়ে গেছে। শান্তি, বিশ্বাস আর প্রজ্ঞার রঙ নীল, সাদা শান্তি ও পবিত্রতার রঙ। গত পনেরো বছর বাংলায় এই রঙের অর্থ অর্থহীন হয়েছে। অন্য দিকে ত্যাগ, সাহস ও জ্ঞানের রঙ গেরুয়া।

বাংলার বাতাস আজ এই রঙ মেখেছে। কিন্তু এই রঙের অর্থ প্রথম থেকেই যেন অর্থহীন পথে হাঁটতে শুরু করেছে। ত্যাগের চিহ্ন অবশ্যই বহন করছে, তা শুধু ধৈর্য ও জ্ঞান ত্যাগের। এমন ত্যাগের উদাহরণ তৈরি করাই যেন সাহসের পরিচয়! এমন সাহস সংখ্যাগরিষ্ঠ আধিপত্যের বিপদ। সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদের রঙ যে কী বিপদ নামায় তার ট্র্যাডিশনে যেন ছেদ নেই।

এই সময়ে কবিগুরুর কয়েকটি কথা স্মরণ করতে হয়। তিনি বলছেন, ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়। কিন্তু এই বিচার করে দেখার দৃষ্টি হারিয়ে দিতে ব্যস্ত চারিধারে। সেই দীপশিখা কোথায়, যার আলোয় সেই দৃষ্টি আলোকিত হবে। কবির কথায়, 'অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে।' অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করার জন্য এমন আলো আজ দেখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

কবি যদিও ধর্মের মধ্যেই সেই আলো আছে বলে মনে করেছেন। সেই ধর্ম কখন মানুষের কল্যাণ দিতে পারে না তাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ধর্মের আক্রোশে যদি বা উপদ্রব নাও করি তবে ধর্মের মোহে মানুষকে নির্জীব করে রাখি, তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে-মজ্জাতে নির্দিষ্ট করে ফেলি। দৈবের প্রতি দুর্বলভাবে আসক্ত করে তুলি। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত, সেই হতভাগ্য দেশে সর্বপ্রকার দৈহিক মানসিক রাষ্ট্রিক অমঙ্গল অব্যাখ্যাতে অচল হয়ে ওঠে।' আবার বললেন, 'ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। ... শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ... তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে।' কিন্তু আমাদের এই কল্যাণে বাধা কোথায়? সেই বাধার কথা কবি বলেছেন, 'যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনও বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।' এই বিভেদ থেকে উদ্ধার কে করতে পারে, কী ভাবে করতে পারে, সে প্রশ্ন কবি রেখেছেন, 'যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। ... বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ, তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি— তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে।'

কবি একদিকে বলেছেন ধর্মের আলো দৃষ্টি খুলে দিতে পারে। আবার আর একদিকে বলেছেন ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। বিভেদসৃষ্টিকারী ধর্ম কবির কাছে একপ্রকার বিকার। এই বিকারেই আমাদের দুর্গতির কারণ। তিনি বলেছেন, 'ধর্মের বিকারে গ্রিস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারে রোম লুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।' এই বিকারে কি আমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছি?

কবির 'গোরা' উপন্যাসের গোরা সনাতন ধর্মের কট্টর উপাসক ও প্রচারক। তার সেই ধর্মে ভারতবর্ষের মুক্তি লুকিয়ে আছে বলে সে মনে করে বিশ্বাস করে এবং তা জাহির করে ও প্রতিষ্ঠিত করার যুক্তিজাল তার অত্যন্ত প্রখর। তার সেই বিশ্বাসকে এক লহমায় বর্জন করতে দ্বিধা করেনি, যখন তার বংশপরিচয় উদঘাটিত হল। দেশ ও মানুষের পরিচয় যে ধর্মে নয়, সে উপলব্ধি ঘটল। গোরার মুখের কথা দিয়ে কবি লিখলেন, আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই— যার মন্দিরের দ্বার কোনও জাতির কাছে, কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও দিন অবরুদ্ধ হয় না— কেবল হিন্দুর দেবতা নয়, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা। ভারতবর্ষের এই দেবতা কী ভাবে হাজির হতে পারে সকল মানুষের জন্য। কবি সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কি না, কোথাও তাহার বাধা আছে কি না বুঝিতে হইবে। তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

সকল মানুষের জন্য ভারতবর্ষের সেই দেবতাকে সত্য করে তোলার জন্য রঙে রঙে এমন বাধা ক্রমে দানা বাঁধছে যা সকল মননকে ডুবিয়ে দিচ্ছে এক অন্ধকারে। এমন কবি-মাসের রঙ আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘের বার্তা দিতে পারে কি না, তা সময় বলবে।

নরেন্দ্রনাথ কুলে, কলকাতা-৩৪

আকাশছোঁয়া দামে আলু-পেঁয়াজ কিনছে জনগণ, কান্নায় দিন কাটছে চাষির

ফি বছর নিয়ম করে বিভিন্ন ফসল ওঠার মরসুমে দেশের চাষিদের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যায়। মাসের পর মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, জল-কাদা গায়ে মেখে চাষিরা তাঁদের ফসল ঘরে তোলে। কিন্তু ফসল বিক্রির সময় দেখা যায়, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। ফসলের দাম না পাওয়ায় চাষিদের যখন চোখের জল ফেলতে হয় তখন তাদেরই উৎপাদিত ফসল খুচরো বাজারে এমন চড়া দামে বিক্রি হয় যে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস ওঠে। এ যেন এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত!

ভারতের মোট আলু উৎপাদনের ২৩ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। অতিফলনের কারণে আলু চাষিরা এ বার দাম না পেয়ে হাহাকার করছে। হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আলু চাষিরা উৎপাদন মূল্যের থেকে অনেক কম দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে অনেকেই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে পারেন। চাষিরা বর্তমানে জ্যোতি আলু বিক্রি করছে কেজি প্রতি ৩.৫০ টাকায় আর চন্দ্রমুখী কেজি প্রতি ৪.৫০ টাকা থেকে ৫ টাকায়। কিছুদিন আগে এর থেকেও সস্তায় আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন চাষিরা। অথচ মানিকতলা থেকে গড়িয়াহাট, কলকাতার প্রায় সব খুচরো বাজারে জ্যোতি আলুর দাম কেজি প্রতি ১৫ টাকা, চন্দ্রমুখী কেজি প্রতি ২০ টাকা। শহরতলির খুচরো বাজারের অবস্থাটাও প্রায় একই রকম। জোগান অফুরন্ত থাকা সত্ত্বেও আলুর দাম শহরের মানুষকে তেমন একটা স্বস্তি দিতে পারল না কেন? মাঝের বিপুল অংশ কারা আত্মসাৎ করে চলেছে? এর উত্তরটা সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে চাষিরাও জানেন। কিন্তু সরকার ভাব দেখায় যেন কিছু জানে না!

পেঁয়াজের দামেও একই অবস্থা। দাম না পাওয়ায় পেঁয়াজ চাষিদের মাথায় হাত, এর পরও খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দামের ঝাঁঝ কিছুতেই কমছে না। ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ সালে দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের মোট পেঁয়াজ উৎপাদনের ৩৫.৪৫ শতাংশ উৎপাদন হয় মহারাষ্ট্রে, ১৭.১৭ শতাংশ মধ্যপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গের পেঁয়াজ চাহিদার সিংহভাগই জোগান দেয় মহারাষ্ট্র, প্রায় ৭০ শতাংশ। পেঁয়াজের উৎপাদন এ বার বেশি হওয়ায় এবং যুদ্ধের কারণে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কুয়েত, ওমান, কাতার, বাহরাইন এবং সৌদি আরবে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ থাকায় দেশের বাজারে পেঁয়াজের যোগান অফুরন্ত। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রের সোলাপুর, নাসিকে চাষিরা কেজি প্রতি ৫০ পয়সা দামে পেঁয়াজ পাইকারি বিক্রি করতে এক রকম বাধ্য হচ্ছে। তারপরও কলকাতার খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার হাটে বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা। পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হয়, একটা সময় এই উৎপাদিত পেঁয়াজের বড় অংশ রপ্তানি হত বাংলাদেশে। বর্তমানে বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ। ফলে এ রাজ্যে পেঁয়াজের জোগানে কোনও রকম ঘাটতি নেই, তারপরও কেন পেঁয়াজের দাম ক্রেতাদের স্বস্তি দিতে পারছে না? তার কারণ অসাধু ব্যবসায়ী,মজুতদার, ফড়েরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। পিছনে থাকেন শাসক দলের নেতারা। চাষিরা ফসলের দাম না পেলেও, তাঁদের 'অভাবি বিক্রি'র সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদাররা সস্তায় ফসল কিনে ব্যাপক ভাবে গুদামজাত করে।

চাষির হাত থেকে ফসল চলে যাওয়ার পরই এই অসাধু চক্র বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে দাম বাড়ায়। সরকার যদি এ বিষয়ে তৎপরতা না বাড়ায়, নিয়মিত ভাবে পাইকারি ও খুচরো বজারে পরিদর্শন না করে এবং সর্বোপরি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, ১৯৫৫ (Essential Commodities Act, ১৯৫৫) অনুযায়ী আলু ও পেঁয়াজ যথেচ্ছভাবে মজুত করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। এর আগে কোনও সরকারই এ কাজ করেনি।

খুচরো বাজারে আলু পেঁয়াজ সহ অন্যান্য কাঁচা আনাজের দাম স্থিতিশীল রাখতে পূর্বতন সরকারের আমলে ২০১২ সালের জুন মাস নাগাদ কৃষি বিপণন দফতরের অধীনে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। ঠিক হয় বাজার পর্যবেক্ষণকারী টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা নিয়মিত ভাবে কলকাতা-সহ জেলার বিভিন্ন বাজারে নজরদারি চালাবে এবং এই কাজে পুলিশের আইন প্রয়োগকারী শাখা তাদের সহযোগিতা করবে।

তবে সাধারণ মানুষের বড় অংশের অভিজ্ঞতা, খাতায় কলমে টাস্ক ফোর্স গঠন হলেও দাম নিয়ন্ত্রণে তাদের ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। এস ইউ সি আই (সি)-র বারবার দাবি তুলেছে সরকার চাষির থেকে ন্যায্য দামে কিনুক এবং তার এজেন্সি মারফত ন্যায্য দামে বিক্রির ব্যবস্থা করুক। পূর্বতন কোনও সরকারই এই দাবি কার্যকর করেনি। বিজেপি সরকারেরও কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, ফড়ে চক্র নিয়ন্ত্রণ করার। পরিস্থিতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

মোদি সরকারের ঘোষণায় স্বর্ণশিল্পে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাতে চলেছে

বিদেশি মুদ্রা (ডলার) বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে অতিমারির সময়ের মতো সংযমী হতে বলেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংযমী হতে হবে, ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার কমাতে হবে, তার একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন। এর অন্যতম হল সোনা। সোনা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, এ জন্য প্রচুর ডলার চলে যায়। তাই প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে অন্তত এক বছর কম সোনা কিনতে বলেছেন। এই ঘোষণার পরেই তিনি সোনার উপর আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেছেন। সোনা আমদানিও সীমায়িত করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে লাইসেন্স প্রতি ১০০ কেজির বেশি সোনা আমদানি করা যাবে না। এ ছাড়া আরও কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে ১৫ দিন পরপর সোনা আমদানির হিসাব দাখিল করার কথা বলা হয়েছে ।

সোনা ক্রয়ে, সোনা ব্যবহারে লাগাম পরালে জুয়েলারি শিল্পে কী প্রভাব পড়বে? অবশ্যই এর ফলে সারা দেশে গয়নাশিল্পের ছোট মালিক ও তাদের লক্ষ লক্ষ কর্মচারীর সামনে নেমে আসবে কর্মহীনতার গভীর অন্ধকার। এক বছর সোনা ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকলে এই সব দোকানে ঝাঁপ পড়বে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়ে পথে বসবে। বাস্তবে দেশের মধ্যে পরিস্থিতিও এখন তাই।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আর পিছানোর জায়গা থাকে না। তখন প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতেই হয়। গয়না শিল্পের মালিকরা দোকান বন্ধ করে প্রতিবাদে মিছিল করছেন। মোদির সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র বারাণসীতে স্বর্ণকারেরা রাস্তায় নেমে প্রতীকী ঝালমুড়ি বেচে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরাখণ্ডে প্রতিবাদ মিছিল চলছে। দেরাদুনে মোমবাতি মিছিল হয়েছে।

এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মোদি সরকার স্বর্ণকারদের বাঁচানোর কোনও উদ্যোগ নিয়েছে কি? এখন পর্যন্ত তেমন ঘোষণা বাস্তবে নেই। পশ্চিমবঙ্গে গয়নার কারিগর ৬৫ লক্ষ। তাদের মধ্যে অন্তত ৩৫ লক্ষ পরিযায়ী। এরা দিল্লি মুম্বাই সুরাট প্রভৃতি শহরে কাজ করেন। এই পরিস্থিতিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার এই মানুষদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করতে কী ভূমিকা নেয় সেটাই দেখার। লক্ষ করার বিষয় যে, পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির প্রচারের ফানুস ফেটে গেছে। ডলারের সাম্প্রতিক এই সংকট পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট। মোদি সরকার যুদ্ধের কারণ দেখালেও বাস্তবে তার বহু আগে থেকেই পুঁজি এই দেশ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে, এমনকি ভারতীয় পুঁজিপতিদের একটা বড় অংশ এ দেশ থেকে বিনিয়োগ তুলে নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে দেশের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়ে টান পড়ছে। ভারতে আভ্যন্তরীণ বাজারের মন্দা বাড়তে বাড়তে আজ যে পরিস্থিতি হয়েছে, তাকে বলে 'স্ট্যাগফ্লেশন'— যাতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে, অর্থনীতি স্থবির হয়ে থাকে। মোদিজি পুঁজিমালিকদের সেবক হিসাবে এই সত্য স্বীকার করতে পারবেন না, তাই সংকটের দায় চাপাচ্ছেন দেশের সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। সেই কারণেই কৃচ্ছসাধনের আহ্বান।

কিউবায় আগ্রাসন চালাতে মার্কিনী ষড়যন্ত্র

একের পাতার পর

ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করে সেখানকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমেরিকা এবার কিউবা আক্রমণ করার অজুহাত সাজাচ্ছে। কিন্তু কিউবার জনসাধারণ মাথা নত করতে অস্বীকার করে সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, 'হয় জন্মভূমি নয় মৃত্যু— আমাদের জয় সুনিশ্চিত'। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সঙ্গে একযোগে আমরা তাঁদের কুর্নিশ জানাই।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই আন্তর্জাতিক গুণ্ডাগিরি ও প্রভুত্বের বাসনা যা শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণে লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। কিউবাকে পদানত করে ল্যাটিন আমেরিকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র দানবিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্যাঙাতরা কষছে, তা ব্যর্থ করার জন্য গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

বিহারে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য নির্যাতিতাদের সুবিচারের আশাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলল

রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ শিক্ষকের পদ ফাঁকা, অথচ সরকার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করছে না। চাকরিপ্রার্থী তরুণ-তরুণীরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিহারের পাটনায়। সেই 'অপরাধে' তাদের ওপর নির্বিচারে লাঠি চালাল বিজেপি সরকারের পুলিশ। মহিলাদের ওপরেও চলল বেপরোয়া লাঠিচার্জ। গুরুতর আহত হলেন বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী। সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করলেন— মেয়েদের ওপর এই ভাবে পুলিশি আক্রমণ হল কেন, বিহারের সদ্য শপথ নেওয়া শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তেওয়ারি প্রকাশ্যে বললেন, 'মেয়েদের বিক্ষোভে আসার দরকার কী? তাদের এ ভাবে রাস্তায় নেমে আসার দরকারটা কী, যখন নারীশক্তির বন্দনার জন্য মোদিজি রয়েছেন?'

শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্যে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এ মন্তব্য এক দিকে যেমন কর্মহীন যুবসমাজের বেকারত্বের যন্ত্রণার প্রতি চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতা, অন্য দিকে নারীপ্রগতিরও চূড়ান্ত বিরোধী। মেয়েদের রাস্তায় বেরনো এবং প্রতিবাদ করা অন্যায় হলে দেশের শিক্ষারত, কর্মরত এবং স্বনির্ভর হতে চাওয়া প্রতিটি নারীকেই অপরাধী বলতে হয়। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সব মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়লেন, প্রাণ দিলেন, অপরাধী তা হলে তাঁরাও। তবে বিহারের শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য ভয়ানক হলেও খুব অপ্রত্যাশিত বা চমকপ্রদ নয়, কারণ আরএসএস-বিজেপির ইতিহাসে নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিরোধী এমন মন্তব্য ও ভাবনার ছড়াছড়ি।

সংঘচালক স্বয়ং গোলওয়ালকর তাঁর বইতে সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং প্রতিপালনকেই হিন্দুরাষ্ট্রের নারীর মূল কর্তব্য হিসাবে দেখেছেন। এমনকি সুরক্ষিত রাখার জন্য নারীকে অন্তঃপুরে বন্দি রাখার নিদানও দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে রাজস্থানে রূপ কানোয়ারকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে গোটা দেশ যখন উত্তাল, তখন সতী প্রথার সমর্থনে গলা ফাটিয়েছিলেন গোয়ালিয়রের বিজেপি নেত্রী বিজয়রাজে সিন্ধিয়া। বেশ কয়েক বছর এগিয়ে এসে ২০১৩ সালে সংঘগুরু মোহন ভাগবতের মন্তব্য মনে করলে দেখা যাবে, তিনি বিবাহকে বলেছেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা চুক্তি, যেখানে স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে নিরাপদে রাখা এবং স্ত্রীর দায়িত্ব ঘর সামলানো। ২০১৯-এ একটি রিপোর্ট পেশ করতে গিয়েও নারীদের ঘরে রাখার সপক্ষে অনুরূপ মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে। ফলে আজ বিহারের শিক্ষামন্ত্রী তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে যে বার্তা দিলেন, তাকে একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত খেয়াল বা মর্জি মনে করার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সমাজ-সংসারে মহিলাদের ভূমিকা এবং অবস্থান সম্পর্কে আরএসএস-বিজেপির মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কথায়।

বিহারের শিক্ষামন্ত্রী উপদেশ দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর নারীশক্তির বন্দনার ভার অর্পণ করে দেশের মেয়েরা যেন নিশ্চিন্তে থাকে। কিন্তু দেশের মেয়েরা শুধু সংবাদমাধ্যমে আর নির্বাচনী সভায় বিজ্ঞাপনী বন্দনা চান না, চান সম্মান, সুরক্ষা ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার। বাস্তবে মোদিজির নারী-বন্দনার আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে যায় দেশ জুড়ে ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যগুলোতে নারীসুরক্ষার হাল দেখে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যে রাজ্যগুলোতে— সেই রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ সর্বত্রই বিজেপির শাসন। গুজরাটে বিলকিস বানোর ধর্ষকদের ফুল-মিষ্টি দিয়ে অভ্যর্থনা, কাঠুয়াতে ধর্ষকদের সমর্থনে বিজেপি কর্মীদের মিছিল, উন্নাওতে বিজেপি বিধায়ক ধর্ষক-খুনি কুলদীপ সেঙ্গারের অপকীর্তি— এমন অজস্র উদাহরণ মোদিশাসিত ভারতে নারীর অগ্রগতি ও নিরাপত্তার ছবিকে 'বেটি বঁচাও বেটি পড়াও'-এর বিজ্ঞাপনী জৌলুসের বাইরে বেশিদূর এগোতে দেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গেও এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। বিগত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনরোষের একটি অন্যতম কারণ ছিল আর জি করে অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এবং তার ধারাবাহিকতায় সন্দীপ ঘোষ থেকে শুরু করে তৃণমূল-আশ্রিত ছোট-বড় নেতাদের দম্ভোক্তি, পার্কস্ট্রিট-কামদুনি থেকে কসবা ল কলেজ পর্যন্ত নানা ঘটনায় নির্যাতিতাকে দোষী প্রমাণের জঘন্য মানসিকতা।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজ্যের একটা বিরাট অংশের মানুষ সেই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তি চান, বিজেপি সরকারের কাছে নির্যাতিতা নারীর জন্য সুবিচারের আশা রাখেন। বিহারের বিজেপি শিক্ষামন্ত্রীর এই সাম্প্রতিক মন্তব্য আবারও সেই আশাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

তীব্র নিন্দা এ আই এম এস এস-এর

আমাদের দেশে মহিলাদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন সম্পর্কে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, এআইএমএসএস-এর সভানেত্রী কেয়া দে ও সাধারণ সম্পাদিকা ছবি মহান্তি ১৫ মে এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন।

সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিতে দেরি হওয়ার প্রতিবাদে পাটনায় কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশ নির্মম ভাবে লাঠি চালালে মহিলারাও রেহাই পাননি। প্রতিবাদী মহিলাদের উপরে লাঠি চালানো হল কেন— সংবাদমাধ্যম এ প্রশ্ন তুললে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন— "মহিলারা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন কেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতিমধ্যেই যখন নারী ক্ষমতায়নের পদক্ষেপ নিয়েছেন, তখন মহিলাদের পড়াশোনা করারই বা দরকার কী?"

এআইএমএসএস মহিলাদের উপর পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জ এবং ওই মন্ত্রীর চরম পুরুষতান্ত্রিক আচরণের তীব্র নিন্দা করেছে। এআইএমএসএস মনে করে, শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য গোটা দেশের মহিলাদের মর্যাদা, অধিকার ও স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতি চরম অপমান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে বিহারের শিক্ষামন্ত্রীকে প্রকাশ্যে দেশের নারীসমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। মহিলাদের শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে এবং সামাজিক সমতা নিশ্চিত করতে বিহার রাজ্য সরকারকে দ্রুত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27
গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 39 Bengali Weekly May 29, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

জাতীয় শিক্ষানীতি পুরোপুরি চালু হলে শিক্ষার ক্ষতিও হবে পুরোপুরি

এনইপি বাতিলের দাবি এআইডিএসও-র

এ রাজ্যে পুরোপুরিভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি '২০ চালু করার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ১৮ মে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট উদ্বেগের। বিগত সরকারের 'মডেল স্কুল' প্রকল্প ও বর্তমান সরকারের 'পিএমশ্রী' প্রকল্প একই। বাছাই করা কিছু স্কুলের বিশেষ উন্নয়নের কথা বলে কার্যত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকতে থাকা হাজার হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়াই হল এই পিএমশ্রী প্রকল্পের মূল কথা। বিগত সরকার রাজ্য শিক্ষানীতি '২৩-এর মাধ্যমে এ রাজ্যে ঘুরপথে জাতীয় শিক্ষানীতি '২০ চালু করেছিল, যার পরিণতিতে রাজ্যে স্কুল স্তরে উচ্চমাধ্যমিক তুলে দিয়ে সেমিস্টার প্রথা চালু, ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, সরকারি স্কুল বন্ধ করা, বেসরকারিকরণ, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে জাতীয় শিক্ষানীতি '২০-এর হাত ধরে এনটিএ-র দুর্নীতি, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে সিলেবাসে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুপ্রবেশ ও ইতিহাসের বিকৃতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক বেসরকারিকরণ হয়েছে। এই অবস্থায় এ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি '২০ পুরোপুরি ভাবে কার্যকরী হলে একদিকে যেমন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কিছু থাকবে না, অন্য দিকে শিক্ষার বেসরকারিকরণ কেন্দ্রীকরণ, বৃত্তিমুখীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণের সিংহদুয়ার পুরোপুরিভাবে উন্মুক্ত হবে, ধ্বংস হবে নবজাগরণের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষার মর্মবস্তু-প্রাণসত্তা।

এআইডিএসও এর বিরুদ্ধে রাজ্যের ছাত্রসমাজ ও শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের কাছে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের মতপ্রকাশের অধিকার হরণ

প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

২০ মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, এই কালা সার্কুলারের ফলে বাস্তবে সরকারি কর্মচারীদের ভারতের সংবিধানপ্রদত্ত মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করা হল। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কর্মরত কর্মচারীদের জন্য এটা বলবৎ থাকলেও এ রাজ্যে চালু ছিল না। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই অধিকারগুলো কেড়ে নিতে চাইছে। এর দ্বারা সরকার বাস্তবে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিজেদের তল্পিবাহকে পরিণত করতে চাইছে এবং তাঁদের মতপ্রকাশের ন্যূনতম অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে।

তিনি বলেন, আমরা এই সার্কুলারের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে এটি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে এই কালা সার্কুলারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল সরকারি কর্মচারী, শ্রমজীবী মানুষ সহ সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এই স্বৈরতান্ত্রিক নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিক্ষা বাঁচানোর দাবি

এ আই ডি এস ও-র

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ও সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি দাবিপত্র পাঠানো হয়।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় এবং সভাপতি মণিশঙ্কর পট্টনায়ক দাবিপত্রে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। কেন্দ্র ও বিগত রাজ্য সরকারের চালু করা নীতিগুলো বাস্তবে শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছে। দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষক শূন্যতা প্রভৃতি আজ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। সরকারি স্কুল বন্ধ হওয়া, বিদ্যালয় স্তরে সেমিস্টার প্রথা প্রবর্তন, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স, বিপুল পরিমাণে ফি বৃদ্ধি, লক্ষাধিক শূন্যপদ ও সর্বোপরি শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে ধ্বংস করে চলেছে। গবেষকরা মুক্তভাবে আজ গবেষণার কাজ করতে পারছেন না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ থাকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। পূর্বতন শাসকদলের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন মদতেই এরই সাথে ক্রমশ বেড়েছে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা, ছাত্রী নিগ্রহ ও অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনা।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে এআইডিএসও-র দাবি— স্কুল সহ সমস্ত স্তরে সেমিস্টার প্রথা বাতিল করতে হবে। স্কুলস্তরে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে। সমস্ত স্কুলে নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত কম্পোজিট গ্রান্ট বরাদ্দ করতে হবে। স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। উপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতে হবে। যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরাতে হবে। সমস্ত বন্ধ হওয়া সরকারি স্কুল খোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্কুলশিক্ষায় ও উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস তৈরি করতে হবে। উচ্চশিক্ষায় কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক ও চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল করতে হবে। পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ইতিহাস বিকৃতি ও সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক-অবৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। একতরফা ও আকস্মিক সিলেবাস পরিবর্তন করা যাবে না। শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষাবিদদের মতামত আহবান করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। উচ্চশিক্ষার প্রাণসত্তা হরণকারী এইচইসিআই (হেকি) বিল প্রত্যাহার করতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রকে সার্বিক ভাবে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। এনআরএফ-এর মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্রের কেন্দ্রিকরণ করা চলবে না। র‍্যাগিং ও থ্রেট কালচার রুখে দিয়ে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ভাবে এ রাজ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে। নিট-পিজি জিরো পার্সেন্টাইল পলিসি বাতিল করতে হবে। কারিগরি শিক্ষার পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি উদ্যোগে কলেজ গড়ে তুলতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলির ফি নির্দিষ্ট করতে হবে। পাঠক্রম শেষে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যাম্পাসিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানগুলিকে চূড়ান্ত সেমিস্টারে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। এনরোলমেন্টের জন্য এআইবি পরীক্ষা ফি ও রাজ্য বার কাউন্সিল দ্বারা চার্জ করা ফি-র পরিমাণ ন্যূনতম করতে হবে। এসসি, এসটি, ওবিসি ও আর্থিক-সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ হোস্টেল স্থাপন করতে হবে। চা-বাগান, সুন্দরবন ও জঙ্গলমহলের মতো প্রান্তিক এলাকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। সমস্ত স্তরের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ নিয়মিত এবং দ্বিগুণ হারে প্রদান করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রি বাস পাস দিতে হবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ধরনের প্রান্তিক ছাত্রছাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাঙ্গনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে হবে।

রাজস্থানে নির্যাতনের শিকার দুই তরুণীর আত্মহত্যার ঘটনায়

রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ এস ইউ সি আই (সি)-র

রাজস্থানের জয়পুরে দিনের পর দিন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে সম্প্রতি একে একে আত্মঘাতী হন দুই বোন। ঘটনা সূত্রে সামনে আসে বিজেপি শাসিত ওই রাজ্যের পুলিশের উদাসীনতা ও অপদার্থতা। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ক্রমবর্ধমান নারী-নির্যাতনের প্রতিবাদ সহ জনজীবনের বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ১৯ মে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

ছবি ঃ (বাম দিক থেকে) ত্রিপুরার আগরতলা, বিহারের পাটনা, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com